Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.01-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের ‘লোকহিত’ এবং রমাপদ চৌধুরীর ‘ভারতবর্ষ’: ‘ভাতা’ প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতা

ড.পরিমল চন্দ্র দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়, বাগডোগরা, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Recently, some States have been providing ‘‘allowances (Bhata)’’ to women from poor and marginalized families. This ‘‘allowances’’ has become a tool for the ruling party to regain political power. The ruling party leaders are encouraging poor and marginalized people to accept the ‘‘allowances’’. People who are very enthusiastic about receiving "allowances" are forgetting the pain of unemployment. Many people do not want to understand this simple fact that "allowances" can’t be a substitute for employment. It is needless to say that people are sacrificing their self-respect and self-esteem while accepting "allowances’’. There is no point in blaming the common people, because they are helpless. Who is responsible for this helplessness of the poor and marginalized people, how to overcome this problem - the matter was explained long ago by the essayist Rabindranath Tagore in his famous essay "Lokhit". On the other hand famous fictionist Ramapada Chowdhuri has shown in his short story "Bharatvarsh" how poor and marginalized people are turning themselves into beggars by giving up their self-esteem and self-respect. This insult to the poor and marginalized people is an insult to the country itself, this subject matter has been highlighted in the discussion article.
Keywords: Helplessness of the poor and marginalized people, Unemployment, Allowances, Self-respect & Self-esteem, Characteristic contradiction of educated middle class Bengali people.

একদিকে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অসহায়তা যখন ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক দল পর্যায়ক্রমে এক দশক কাল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ক্রমে যখন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সম্মুখীন, স্বজনপোষণ-ঘুষ-তোলাবাজি সহ একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে, দলের নেতা-বিধায়ক-মন্ত্রীরা যখন অত্যন্ত বিব্রত, তাঁরা যখন বুঝতে পারছেন পরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসা অত্যন্ত কঠিন; সেই সময় দলের শীর্ষ নেতা এক প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করে দিলেন – আসন্ন নির্বাচনে তারা পুনরায় জয়ী হতে পারলে রাজ্যের দরিদ্র-প্রান্তিক পরিবারের মহিলাদের ‘ভাতা’ দেবেন। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ – দেখা গেল সেই নির্বাচনে তাঁরা বিপুল সাড়া পেল এবং রেকর্ড ভোটে জয়ী হল।প্রথম পর্যায়ে শুধু দরিদ্র-প্রান্তিক পরিবারের মহিলাদের জন্য এই ভাতা চালু হলেও, পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত

পরিবারের মহিলারাও এই 'ভাতা'-র আওতায় চলে এলেন। 'ভাতা'-র ঘোষণায় অত্যন্ত উৎসাহী মানুষ ভুলে গেলেন দশক কালের বঞ্চনার কথা। তারা ভুলে গেলেন কর্মহীন বেকার যুবক-যুবতীদের কথা। একমাত্র পুত্রসন্তান পরিযায়ী শ্রমিক, 'ভাতা'-র ঘোষণায় উৎসাহী জননী ভুলে গেলেন তার যন্ত্রণার কথা।কর্মহীন স্বামী পেটের তাগিদে ভিনরাজ্যে বসবাস করেন, স্ত্রী তাকে ফোন করে জানালেন, ভোট মিটলেই তিনি 'ভাতা' পাবেন। দীর্ঘদিন স্বামীকে দেখতে না পাবার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও ভুলে গেলন 'ভাতা'-র ঘোষণায়। অভাবের সংসারে মা লক্ষ্মীর আগমন – দান, অনুদান, ভাতা- সে যা-ই হোক না কেন, পরিমাণ যত সামান্যই হোক না কেন; বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, এমনকি মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের জননী-গৃহিণীগণও ভক্তিভরে স্বাগত জানালেন। তাঁরা ভাবলেন, অভাবের সংসারে এটুকুই বা কে দেয়! 'ভাতা' যখন কর্মসংস্থানের বিকল্প, তখন তা শুধু জননী-গৃহিণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে জনসমর্থন পনেরো আনা নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসা কঠিন। এই বাস্তব সত্যটিকে অনুধাবন করতে পেরে সরকার বিভিন্ন নামে প্রান্তিক মানুষদের জন্য আরো কিছু 'প্রকল্প' চালু করে দিল। ফলস্বরূপ শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদলগুলি এতদিন ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেসব অস্ত্রে শাণ দিচ্ছিল, 'ভাতা'-র চাপে পিষ্ট হতে হতে এক সময় তাতে মরচে ধরে গেল। 'প্রকল্প' নামে বিভিন্ন 'ভাতা' যদি জনসমর্থন নিজেদের অনুকূলে রাখবার প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এই 'ভাতা'-বৃদ্ধিই যে অদূর ভবিষ্যতে শাসকদলের টিঁকে থাকার প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। 'ভাতা'-র নিশ্চয়ই কিছু আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে।দরিদ্র-প্রান্তিক বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের হাতে অর্থ এলে তা সঞ্চিত থাকে না, হাতবদল হয়ে বাজারে কেনাকাটার গতি ঊর্ধ্বমুখী তোলে। এ বিষয়ে দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদগণ নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন। আমাদের প্রশ্ন অন্য জায়গায়। সমাজের একটা বড়ো অংশের মানুষ যদি ক্রমশ 'ভাতা'-নির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ 'ভাতা'-বৃদ্ধির দাবি তুলবে। বর্তমান সময়ে যে হারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে, মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গেলে 'ভাতা'-র পরিমান বাড়াতে হবে অনেকটাই। তখন সাধারণ মানুষের এই 'ভাতা'-বৃদ্ধির দাবিকে কি সরকার সুনজরে দেখবে? - এ বিষয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। সমাজের সচেতন মানুষেরা আজ আর অজ্ঞাত নন যে, সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ্যভাতা বৃদ্ধির দাবিকে সরকার সুনজরে দেখেনি। আগামী দিনে মানুষ যদি 'ভাতা'বৃদ্ধির দাবি তোলে এবং সেই দাবি মেটানোর ক্ষমতা যদি সরকারের না থাকে, মানুষ কি তখন অপমানিত বোধ করবেন না? বস্তুতপক্ষে কোনো দানের পেছনে যদি 'প্রীতি' অপেক্ষা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় টিঁকে থাকার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে মানুষের অপমান, মনুষ্যত্বের অপমান যে শুধু সময়ের অপেক্ষা একথা বলাই বাহুল্য।'ভাতা'-র আরেকটি বিশেষ দিক রয়েছে। 'ভাতা' যেহেতু ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার, সেহেতু বিরোধী দলের লোকেরাও দ্বিগুণ 'ভাতা'-র প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে।এভাবে যদি 'ভাতা' নিয়ে শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহলে আখেরে জনসাধারণের মঙ্গল কতোটা হতে পারে – এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী না করে বরং একটি কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতেই পারে যে, সমাজের একটা বড়ো অংশের মানুয অচিরেই 'ভাতাজীবী'-তে পরিণত হবেন।

ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও প্রায় একশত দশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ বর্তমান সময়কার 'ভাতা'-প্রদান বিষয় প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'সবুজপত্র'-এ 'লোকহিত' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, -

> লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং 'এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত' হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।… আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না।উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজেই করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলেই চলিবে না - ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে।[১]

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, "লোকসাধারণ বলিয়া যে একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে"- এটা খুব করে মনে পড়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে। এ কারণেই আমাদের দেশে যেকোনো সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। নির্বাচন মিটে গেলে এই সব প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই রক্ষা করা হয় না। আলোচ্য 'লোকহিত' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন, - "মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।"[২] সরকার আমাদের দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের যে 'ভাতা' প্রদান করে থাকে, সেই 'ভাতা'-র প্রকৃতি নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে।তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের যে 'ভাতা' প্রদান করা হয়ে থাকে, তা 'ভিক্ষা' নয় কিছুতেই। যদি কেউ এই অর্থ-রাশিকে 'ভিক্ষা' বলে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের অপমান করবার জন্যই তারা এমন কথা বলছেন। 'ভাতা'-র অর্থ-রাশি ঋণও নয়। ঋণ গ্রহণ করলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদসহ ফেরত দিতে হয়।নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেটাতে না পারলে জরিমানাও দিতে হয়। দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের যে 'ভাতা' দেওয়া হয়ে থাকে, তা মিটিয়ে দেবার কোনো দায় থাকে না। 'ভাতা' ঋণ নয়, ভিক্ষা নয়; তাহলে কি 'প্রাপ্য'? প্রকৃতপক্ষে, কোনো অর্থরাশিকে আমরা 'প্রাপ্য' বলে দাবি করতে পারি, যদি তার পশ্চাতে আমাদের কোনো না কোনো কর্মের বিনিময় থাকে। কর্ম না করে কোনো কিছু দাবি করলে তাকে কিছুতেই 'প্রাপ্য' বলা যায় না। 'ভাতা' ভিক্ষা নয়, ঋণ নয়; আবার প্রাপ্যও নয়। তবে একথা ঠিক যে, 'ভাতা' প্রদানের মাধ্যমে আমাদের নির্বাচিত সরকার দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের একপ্রকার 'হিতসাধন' করে চলেছেন।প্রশ্ন হ'ল, 'ভাতা' প্রদানের মাধ্যমে এই 'হিতসাধন' বা 'হিতৈষিতা'-র অধিকার কি একটি নির্বাচিত সরকারের থাকতে পারে? মনে রাখতে হবে যে, সরকারের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।যে অর্থ সরকার জনগণের কল্যাণে ব্যয় করে থাকে, তা সমাজের সকল শ্রেণির মানুযের 'কর'-এর টাকা। এই টাকা একটি নির্বাচিত সরকার ভোটপূর্ব প্রতিশ্রুতি মেটানোর জন্য দান-ধ্যান করে খরচ করতে পারে কি না - এ বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। অধিকার-অনধিকারের বিষয়টিকে আপাতত সরিয়ে নিলেও একটা মৌলিক প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।'ভাতা' প্রদানের মাধ্যমে এই যে মানুষের হিতসাধন প্রচেষ্টা, তাতে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ কতোটা সম্মানিত বোধ করেন? বিষয়টিকে অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় যে কথাগুলি বলেছেন, - "হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায়- তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা"[৩] – এই কথাগুলি কিন্তু 'ভাতা'-প্রদান প্রসঙ্গেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের প্রতি প্রীতিবশতঃ সরকার তাদের আর্থিক সহায়তা করে থাকে, তাহলে

সরকার সেই সব দরিদ্র মানুষদের থেকে কোনো রকম কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারে না। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালে সমাজ-মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনা নজরে এসেছে, যেখানে স্পষ্টতই দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের থেকে ‘ভাতা’-র বিনিময়ে ভোট প্রার্থনা করা হয়েছে।প্রকাশ্য জনসভায় ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারা ‘ভাতা’ পাচ্ছেন কি না। এমনও বলতে শোনা গেছে যে, শাসকদল সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত না করালে ‘ভাতা’ বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুত, প্রকাশ্য জনসভায় শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের মুখ থেকে যদি এ ধরনের কথা-বার্তা শোনা যায়, দলীয় হাইকম্যান্ড থেকে যদি তাদের সতর্ক করা না হয়, তাহলে স্বীকার করতে কোনো অসুবিধে থাকার কথা নয় যে, ‘ভাতা’ প্রদানের পশ্চাতে আর যে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন; সেখানে যথার্থ লোকহিত, হিতৈষিতা বা প্রীতি-র কোনো স্থান নেই। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ‘লোকহিত’ প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা মনে রাখছেন না বলেই আমাদের ধারনা,- “এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই – সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা।“[৪]

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে গেলে ‘ভাতা’-র মুখাপেক্ষী আমাদের দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের প্রতি সত্যিই করুণা জন্মে। মনে প্রশ্ন জাগে, এভাবে আর কতদিন এই শ্রেণির মানুষেরা পদদলিত হবেন! ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধান, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মানুষের দ্বারা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের প্রতিনিয়ত অসম্মান কি কোনোদিন সমাজ থেকে দূরীভূত হবে না? স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ৭৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, তবুও আমরা এই সমস্যাটিকে সমাজের চারপাশে প্রবলভাবেই বিদ্যমান দেখতে পাই। আসলে যে পথে এই সমস্যার সমাধান, আমাদের দেশের লোকসাধারণকে আমরা সেই পথে খুব একটা এগিয়ে দিতে পারিনি। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে, -

> আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে,মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে, যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি ‘তোমার কর্তব্য করো’, মহাজনকে বলি ‘তোমার সুদ কমাও’, পুলিশকে বলি ‘তুমি অন্যায় করিয়ো না’- এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কত দিন কত দিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব ‘যতটা পার তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও’-সে হয়না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে, কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।[৫]

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য ‘লোকহিত’ প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছিলেন যে, - ‘আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না।’[৬] বস্তুত, লোকসাধারণ যদি নিজেকে ‘লোক’ বলে জানতে চায়, তাহলে পরস্পরের মধ্যেকার সংযোগ বাড়াতে হবে এবং এই সংযোগ বৃদ্ধির একমাত্র পথ ‘লেখাপড়া শেখা’। মানুষ যদি সামান্য লেখাপড়া শিখতে পারে, তাহলে তার অনুভবশক্তি যেমন ব্যাপ্ত হয়ে উঠবে, তেমনি চেতনার অধিকারও প্রশস্ত হয়ে উঠবে। লেখাপড়া শিখে মানুষ যদি আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে দেখতে পায়, তাহলে তাকে আর জমিদারের, মহাজনের,

রাজপুরুষের, ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে না। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের যে অর্থরাশি ‘ভাতা’ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে, তার পরিমাণ খুবই সামান্য। কিন্তু এই ‘ভাতা’ গ্রহণ করতে গিয়ে মানুষকে যে পরিমাণ আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হচ্ছে তা একেবারেই সামান্য নয়।

আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ভদ্রসমাজের দয়া-দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় দিন কাটিয়ে আমাদের দেশের লোকসাধারণ যে প্রকারান্তরে নিজের অস্মিতা ও অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে, নিজস্ব বৃত্তি বা পেশা ভুলে যেতে বসেছে – এই করুণ চিত্রটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার রমাপদ চৌধুরী তাঁর সুবিখ্যাত ‘ভারতবর্ষ’ গল্পটিতে।

রমাপদ চৌধুরীর ‘ভারতবর্ষ’ গল্পটির রচনাকাল ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮ খ্রি.)। গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ‘লিটারেরি ওলিম্পিয়ানস্’ সংকলনে মুদ্রিত হয়।অনুবাদ করেছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লিনটন বি সিলি। বস্তুত, রমাপদ চৌধুরীই একমাত্র ভারতীয় লেখক, যাঁর গল্প ‘লিটারেরি ওলিম্পিয়ানস্’ সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। ‘ভারতবর্ষ’ গল্পটির অভ্যন্তরে রয়েছে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে লোকসাধারণের এক শোচনীয় পরিণতির কথা। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন:

> ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো-একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাতে দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার সুবিধা যতই থাক্ তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতে পারে না।সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে যথার্থভাবে হারাই।[৭]

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের উক্ত কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, ভারতবর্ষের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষক-শ্রমিক নির্ভর হলেও, তারা আজও নিদারুণ অভাব-অনটনে দিন কাটায়। কেন তাদের এই পরিণতি? –কারণ তারা তাঁদের সমস্ত কর্মফল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের তথাকথিত ভদ্রসমাজ কিংবা সরকারের হাতে তুলে দিয়ে সরকারেরই হাত দিয়েই তার সুবিধা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। ফলে জলদান, বিদ্যাদান সমস্তই সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, - ‘এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে।দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত এইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ।’ [৮] কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী যখন ‘ভারতবর্ষ’(১৯৬৮ খ্রি.) নামক গল্প রচনা করেছেন, তখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ দুই দশক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে।একসময় আমাদের ধারণা ছিল, ‘স্বরাজ’ এলে তবেই আমাদের দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ শুরু হবে। কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী ‘ভারতবর্ষ’ গল্প রচনাকালীন সময়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘ দুই দশক কাল অতিক্রান্ত হলেও আমাদের দেশের লোকসাধারণের একটা বড়ো অংশ আজও ভদ্রসমাজ তথা সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। একথা ঠিক যে, লোকসাধারণের একটা বড়ো অংশের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতা যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি আমাদের দেশের ভদ্রমণ্ডলীর একাংশ ‘কাঙালি ভোজন’ বা ‘দরিদ্র নরনারায়ণ সেবা’-র নামে নিজের আভিজাত্য প্রকাশ করে পরম তৃপ্তি লাভ করে চলেছেন।মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতা গল্পকার রমাপদ চৌধুরীকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে।

ইতোপূর্বে অন্য একটি গল্পে (চন্দ্রভস্ম) রমাপদ দেখিয়েছেন, সমাজের একদল স্বার্থপর মানুষ ব্যবসার স্বার্থে কীভাবে দরিদ্র-প্রান্তিক বা অসহায় মানুষদের ভিখিরি করে তোলে।

ভিখিরি করে তোলা এবং ভিখিরি হয়ে ওঠা – এই দুটো বিষয়ই ফুটে উঠেছে ‘ভারতবর্ষ’ গল্পটিতে। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ দুই দশককাল পরেও সমাজের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির যে প্রবণতা লক্ষ্য করে বেদনায় আহত হয়েছেন, সেই ভিক্ষাবৃত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশ্বমহাযুদ্ধকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের এক ট্রাজিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকাহিনী অনুযায়ী - নামগোত্রহীন একটি হল্ট-স্টেশন্, ফৌজী সংকেতে যার নাম BF332 – সেই হল্ট-স্টেশনের নিকটবর্তী একটি গ্রামে মাহাতোদের বসবাস। এতকাল ধরে মাহাতোদের জীবনধারা তাদের বংশপরম্পরার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে প্রবহমান ছিল। তারা ক্ষেতি করতো, জনারের বীজ রুইত, নানাবিধ সবজি ফলাতো,চিংড়ি-সরপুঁটি-মৌরলা মাছ ধরতো। দূরে, অনেক দূরে ভুরকুণ্ডার শনিচারী হাটে মুরগী কিংবা মুরগীর ডিমও বেচতে যেত মাহাতো-গাঁয়ের মানুষ।কখনো কখনো সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ-লড়াইও খেলতে যেত। মাহাতো-গাঁয়ের মানুষেরা নিজেদের একান্ত নিজস্ব জীবনধারার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। গ্রামের পার্শ্ববর্তী যে হল্ট-স্টেশন্, সেখানে কোনো ট্রেন থামত না। স্টেশন্ বা ট্রেনের প্রতি মাহাতোদের বিশেষ আকর্ষণ বা কৌতূহলও ছিল না। কিন্তু, যেদিন থেকে আমেরিকান সৈন্যদের বিশেষ ট্রেন ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীদের অন্যত্র নিয়ে যাবার পথে শুধু ব্রেকফাস্টের জন্য আণ্ডা হল্ট-স্টেশনে দাঁড়াতে শুরু করলো, ধীরে ধীরে মাহাতোদের জীবনধারাও বদলে যেতে যেতে শেষপর্যন্ত এক ট্রাজিক পরিণতিতে পৌঁছে গেল।

গল্পকাহিনীর সূচনাপর্বে দেখা যায়, আমেরিকান সৈন্যদের একটি বিশেষ ট্রেন হল্ট-স্টেশনে ব্রেকফাস্টের জন্য থামলে পরে, কাঁটাতারের বেড়ার সামান্য দূরে মাহাতোদের একটি নেংটি-পরা ছেলে চোখ বড় বড় করে আমেরিকান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে।একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে ‘হে-ই’ বলে চিৎকার করে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা ছুটে পালাল মাহাতোদের গাঁ-য়ের দিকে। গল্পকাহিনীর কথক ঠিকাদার মশাই ভেবেছিলেন, ছেলেটি বোধহয় আর কোনও দিন আসবে না। কিন্তু, কথকের ধারণা ভুল প্রমাণিত হ’ল।আবার যেদিন ট্রেন দাঁড়াল, কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা অন্য আরেকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন সৈনিক তার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আই-কে বলল, ‘অফুল’! মাহাতোদের এই ছেলে দুটোকে দেখে আমেরিকান সৈন্যের মুখ থেকে উচ্চারিত ‘অফুল’ শব্দটি গল্পকথকের ভালো লাগেনি। তাঁর মনে হ’ল এই শব্দটি যেন তাঁকেই প্রকারান্তরে খোঁচা দিয়েছে। ছেলে দুটোর ওপর কথক ঠিকাদারের খুব রাগ হল। দিন কয়েক পরে আবার যখন ট্রেন এসে দাঁড়াল, কাঁটাতারের ওপারে শুধু ওই ছেলে দুটি-ই নয়, খাটো কাপড়ের একটা বছর পনেরোর মেয়ে, দুটো পুরুষও ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।এভাবে দিনের পর দিন ট্রেন এসে দাঁড়ালেই মাহাতো-গাঁয়ের লোকেরা ভিড় জমাতে লাগলো এবং গল্পকাহিনীটিও ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেল –

> একজন, দুজন, পাঁচজন – সেদিন দেখি জনদশেক মাহাতো-গাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখেই মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানালায় খাকী রঙ দেখেই বোধ হয় ওরা বুঝতে পারত ... তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কালো কালো নেংটি-পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির

> মেয়েগুলোকে… শুধু খালি গা মাহাতো বুড়োর পায়ে একটা টাঙি-জুতো, …একজন সৈনিক ইয়াঙ্কি গলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলে। আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে সে হিপ পকেটে হাত দিল। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিলে মাহাতোদের দিকে।[৯]

আমেরিকান সৈনিক একটা চকচকে আধুলি মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিলেও, সেদিন তারা সেই আধুলিটি তুলে নিতে কিছুটা ইতস্তত বোধ করেছিল। তারা হয়তো বা বুঝতে পেরেছিল, এই চকচকে আধুলিটি তুলে নেওয়া আর মাহাতোদের এত কালের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-আত্মসম্মান-আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া একই কথা।কিন্তু, গল্পকাহিনীর এই বিশেষ মুহূর্তে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এগিয়ে এলেন গল্পকাহিনীর কথক-ঠিকাদার –

> ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিল দেখে আমি বললাম,সাহেব বখশিশ দিয়েছে, বখশিশ, তুলে নে। … সবাই সকলের মুখের দিকে তাকাল, কেউ এগিয়ে এল না। আমি আধুলিটা তুলে মাহাতো বুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল,তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারও মুখে কোনও কথা নেই।[১০]

গল্পকাহিনীর কথক ঠিকাদার কর্তৃক মাহাতো বুড়োর হাতে চকচকে আধুলিটি তুলে দেবার পর যা ঘটা স্বাভাবিক, গল্পে ঠিক তাই ঘটেছে – "দিন কয়েক কোনও ট্রেনের খবর ছিল না। চুপচাপ, চুপচাপ।হঠাৎ সেই কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিজ্ঞেস করলে, টিরেন আসবে না বাবু?"[১১] আবার যেদিন মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন এসে দাঁড়ায়, যথারীতি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে মাহাতো-গাঁয়ের লোকেদের ভিড় ভেঙে পড়ে। কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটা হাসতে হাসতে পয়সা চাইতে থাকে। জনৈক আমেরিকান সৈন্য অনেকগুলো আনি-দুআনি মুঠোর মধ্যে নিয়ে মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দেয়।মাহাতো-গাঁয়ের সকলে পয়সা কুড়োনোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাহাতো বুড়ো সকলকে ধমকে দিলেও তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। অতঃপর ট্রেন আসে, ট্রেন যায়; আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মাহাতো-গাঁয়ের লোকেদের ভিড়।শুধু দিন কয়েক আসেনি মাহাতো বুড়ো। গল্পকাহিনীর কথক ঠিকাদারের ভাবতে ভালো লাগলো যে, গ্রামের সকলে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বখশিশের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়লেও মাহাতো বুড়ো এমনটি করেনি। প্রথম প্রথম মাহাতো-গাঁয়ের লোকেদের ভিড় দেখে আমেরিকান সৈন্যরা খুশি মনেই বখশিশ দিয়েছে। কিন্তু পরে যখন এটা প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তখনই একদিন গল্পকথক এক চরম অপমানের সম্মুখীন হলেন –

> সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা বখশিশ বখশিশ বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই ই খাকী বুশ-শার্টের গার্ড জানকীনাথের সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে যেতে চিৎকার শুনে থুতু ফেলার মতো গলায় বলে উঠল, ব্লাডি বেগার্স … আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল … মাথা তুলতে পারলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠলাম … ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।[১২]

যে মাহাতো বুড়োকে নিয়ে গল্পকথকের গর্ব ছিল, তাও গল্পের শেষে ধুলোয় মিশে যায়।আণ্ডা হল্ট-স্টেশনে যেদিন শেষ ট্রেনটি এসে দাঁড়ায়, সেদিন –

> সেই মুহূর্তে চোখ পড়ল মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিশ, সাব বখশিশ ! ... কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্যদিনের মতো এবারে আর আণ্ডা হল্টে এসে থামল না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আণ্ডা হল্টকে উপেক্ষা করে হুস্ করে চলে গেল।[১৩]

গল্পকথক জানতেন এই হল্ট-স্টেশনে আর ট্রেন থামবে না। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের মানুষদের জীবনের চরম ট্রাজেডি এখানেই যে,- “...সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব – সব ভিখিরী হয়ে গেল।“[১৪]

বস্তুত, মাহাতো-গাঁয়ের লোকেরা যতদিন নিজেদের জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ততদিন সম্মানের সঙ্গেই বেঁচে ছিল। কিন্তু, যেদিন তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বখশিশের লোভে স্টেশনের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো, সেদিনই তারা সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল।গল্পকাহিনীর কথক ঠিকাদারের ভূমিকাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। গল্পকাহিনীর এই কথক ঠিকাদার নিঃসন্দেহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিনিধি। কথা-সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর গল্পোপন্যাসে বারবার তুলে ধরেছেন প্রভূত পরিমাণ স্ববিরোধিতা বা contradiction এর কথা। ‘ভারতবর্ষ’ গল্পের কথক ঠিকাদার চরিত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়।লক্ষণীয়, যে কথক ঠিকাদার গল্পের শেষে মাহাতো-গাঁয়ের লোকেদের, বিশেষত মাহাতো বুড়োর ভিখিরীতে পরিণত হওয়ার কারণে বেদনায় আহত হয়েছেন, সেই কথক ঠিকাদারই একদিন মাহাতো বুড়োর হাতে আমেরিকান সৈন্যদের ফেলে দেওয়া চকচকে আধুলিটি তুলে দিয়েছিলেন। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে ‘ভারতবর্ষ’ গল্পের কথক ঠিকাদারের মতো চরিত্রের অভাব নেই। এই শ্রেণির মানুষেরাই বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের ‘ভাতা’ গ্রহণে উৎসাহিত করে। আবার এই শ্রেণির মানুষেরাই অনেক সময় ‘ভাতা’-র মুখাপেক্ষী মানুষদের নির্মম সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। ‘ভাতা’, ‘দান’, ‘অনুদান’ – এসব যে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান নয়, এসব গ্রহণ করতে গেলে যে আত্মসম্মান কিংবা আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে আপোষ করতে হয়, এ কথাটি দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষদের বোঝানোর মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি বিবেকের সত্যিই বড়ো অভাব। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের ‘লোকহিত’ কিংবা রমাপদ চৌধুরীর ‘ভারতবর্ষ’ গল্পপাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি বিবেক পুনরায় জাগ্রত হতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, জীবেন্দু, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ কালান্তর ও অন্যান্য রচনা, তৃতীয় গ্রন্থবিকাশ সংস্করণ, ২০১৩, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-১৪।
২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৭।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮।
৯. চৌধুরী,রমাপদ,গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ,অক্টোবর, ১৯৯৯,আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা-৯,পৃষ্ঠা- ৫৬৭।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা – ৫৬৭।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬৭।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬৯।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।